নতুন কর্মকৌশলের প্রয়োজনীয়তা

ডগলাস এ. জনসন

মানবাধিকার আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার সুরক্ষায় গত ক'দশকে আধুনিক মানবাধিকার আন্দোলনে সাধিত হয়েছে বিশাল অগ্রগতি। এ আন্দোলন সকল প্রকার অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিন্দাজ্ঞাপনকারী এবং নারী ও শিশু অধিকার সংরক্ষণকারী নতুন এক আন্তর্জাতিক কনভেনশনের সূচনা করেছে। এ আন্দোলন সমর্থন যোগ্য সকল বৈধ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে আন্তর্জাতিক ঐকমত্যের সৃষ্টি করেছে। আন্দোলনের মাধ্যমে বহু রাজনৈতিক বন্দীর নিরাপত্তা বিধান সহ তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বহু দেশে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিধিমালা মেনে চলতে গড়ে তোলা হয়েছে অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র পর্যায়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠান। এসব সফলতাগুলো যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ বা তা অর্জনে যে কতটা বেগ পেতে হয়েছিল তা বাস্তবিকই বোঝানো মুশকিল।

এ অগ্রগতিতে ৩টি কর্মকৌশল প্রধান ভুমিকা পালন করেছে:

১) আন্তর্জাতিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা, যা কনভেনশান ও বিধিমালা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে
২) এ বিধিমালা মানা হচেছ কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা
৩) সরকারি কোন কর্মদ্যোগ বা ঔদাসীন্য বিধিমালা লঙ্ঘণের কারণ হলে তার নিন্দা বা ধিক্কার জানানো।

গৃহীত কৌশলগুলো মানবাধিকারের অগ্রযাত্রায় বিরাট প্রভাব ফেলেছে বিধায় তা অবিরাম অনুসরণ ও সমর্থনের দাবী রাখে। তবে এটাও সত্যি যে এ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাও রয়েছে এবং এ কৌশলমালা মানবাধিকার সংক্রান্ত ভয়াবহ সমস্যা সমাধানে যথেষ্ঠ নয়।

নির্যাতন-সমস্যার কথাটাই ধরা যাক। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক কনভেনশান এবং বিধিমালার পাশাপাশি জাতীয় আইনমালা ও সাংবিধানিক নিরাপত্তার উপস্থিতি যতটা লক্ষ্য করা যায়, মানবাধিকার সংক্রান্ত অন্য যে কোন বিষয়ে তা অনুপস্থিত। উপরন্তু বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা অত্যাচার-নিপীড়নের এসব ঘটনার সুক্ষ পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। নির্যাতনের শিকার শত সহস্র লোকের জন্য সারা বিশ্বে রয়েছে ২৫০ টি চিকিৎসা কেন্দ্র। এখানে চিকিৎসার পাশাপাশি তাদের উপর পাশবিক নির্যাতনের বেদনাবিধূর কাহিনীও লিপিবদ্ধ করা হয় যত্নসহকারে।

এত কিছুর পরও ২০০০ সালে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল নির্যাতনের বিরুদ্ধে ৩য় আন্তর্জাতিক ক্যাম্পেইন চলাকালে লক্ষ্য করে যে, ১৯৭৪ সালের ১ম ক্যাম্পেইনে অত্যাচার নিপীড়নের যে ব্যাপক চিত্র ফুটে উঠেছিল তার আসলে কোন পরিবর্তনই হয়নি।

কেবল গত দশকেই বসনিয়া, রুয়াডা, সিয়েরা লিওনে ঘটেছে নির্যাতনের ভয়াবহ সব ঘটনা। এখন পর্যন্ত এসব দেশ ছাড়াও আরও ১৫০ টিরও বেশী দেশে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। আমি পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই: *'কিছু একটা হয়ত কাজ করছে না'*।

আজ অগ্রসরমান মানবাধিকার ইস্যুর পক্ষে বিস্তৃত ক্ষেত্র রচনায় সমাজের আরও বড় অংশ ও সেক্টরের অন্তর্ভূক্তি প্রয়োজন। পাশাপাশি প্রয়োজন ব্যাপক মাত্রায় কর্মকৌশলগত উন্নয়ন। একমাত্র নতুন নতুন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে যা করা যেতে পারে।

সারা বিশ্ব ব্যাপী নিবেদিত মানবাধিকার কর্মীবৃন্দ নতুন নতুন উদ্যোগ উদ্ভাবন ও কৌশলগত মোর্চা সৃষ্টি সহ অপ্রত্যাশিত সেক্টর থেকেও অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। 'দি নিউ ট্যাকটিক্স ইন হিউম্যান রাইটস' প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হল উদ্ভাবনী চিন্তা সম্পন্ন এসব কর্মীদেরকে একত্রিত করা এবং অন্যদেরকে তাদের কাজের মাধ্যমে উৎসাহ যোগানো। এ ওয়ার্কবুকে ছাত্র, গ্রামবাসী, সরকারি কমিশনার এবং অন্য আরও অনেকের দ্বারা রচিত ৭৫টিরও বেশী নব ধারার উৎসাহব্যঞ্জক কাহিনী সংযোজিত হয়েছে, যারা স্বতন্ত্র প্রযুক্তি অথবা বর্তমান উপকরণকে কাজে লাগিয়ে সুষ্টু নির্বাচন, বিশুদ্ধ পানি, রাজনৈতিক বন্দী-মুক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন ইস্যুতে কাজ করে থাকেন। দিক নির্দেশক এসব কাহিনী মানবাধিকার অর্জনের পথে অনুপ্রেরণা যোগাবে নি:সন্দেহে।

বর্তমান কৌশলের সীমাবদ্ধতা

অবিরাম নির্যাতনের ঘটনা আজ সমগ্র বিশ্ব বাসীর জন্য কঠিন এক চ্যালেঞ্জ। মানবাধিকার আন্দোলনের অতি প্রচলিত তিনটি কৌশল প্রয়োগের পরও নির্যাতনের ঘটনা কমেনি বিধায় আজ এ কৌশলের সীমাবদ্ধতা নিয়ে ভাববার সময় এসেছে। অনেকে মনে করেন তথাকথিত "ট্যাকটিকাল ম্যাপিং"প্রক্রিয়াই এ সীমাবদ্ধতার জন্য দায়ী।

অত্যাচারী এবং অত্যাচারিতের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজতে গিয়ে ১০ জনের এক বিশেষজ্ঞ দল অন্য এমন সব সম্পর্ক বা কারণ চিত্রায়িত করেছেন, যা মৌলিক অবক্ষয় সহ নির্যাতন ঘটনার জন্য দায়ী। নির্যাতনকারী সাধারণত অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন দলের সদস্য হয়ে থাকে, তারা বিশেষ কোন থানা বা সামরিক ছাউনির সদস্যও হতে পারে। আমরা এদের চেইন অব কমান্ড খুঁজতে গিয়ে সরাসরি এসব সম্পর্ক উদঘাটনের চেষ্টা করি, যে কমান্ড নির্যাতন পরিকল্পনা, তা কার্যকর করা ও এ সংক্রান্ত তহবিল যোগানে ভূমিকা রাখে । তবে আমরা সম্ভাব্য অন্যান্য সম্পর্ক ও সম্ভাবনার কথাও বিবেচনায় এনেছি। --স্থানীয় থেকে আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত ৪০০ এর অধিক এ ধরণের সম্পর্ক প্রাথমিক মানচিত্রে তুলে ধরা হয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি যে ডায়াগ্রাম বা রেখাচিত্রে প্রতিস্থাপিত প্রত্যেক সম্পর্ক বা কারণ সম্ভাব্য সেই স্থানটিকে চিহ্নিত করেছে যেখানে দাঁড়িয়ে নির্যাতনকারীকে নিয়ন্ত্রণ বা বাধা দেওয়া সম্ভব। রেখাচিত্রের সাহায্যে আমরা বিভিন্ন সম্পর্ক এবং সে সম্পর্কের লজিক্যাল চেইন বা যৌক্তিক নিগড় চিত্রায়িত করেছি, যা অবশ্যই নির্যাতনকারীকে বাধা দানে প্রভাব রাখবে (এ অর্থেই এর নাম দেয়া হয়েছে "ট্যাকটিকাল ম্যাপ")। আর তা করতে গিয়ে আমরা যা খুঁজে পেয়েছি, সেগুলো হল:

১. বেশির ভাগ কর্মকৌশলের সুত্রপাত করা হয়েছে একেবারে আন্তর্জাতিক স্তর থেকে, যার অর্থ এখানে রয়েছে সম্পর্কের আরও নানা স্তর, যে স্তরগুলো পরোক্ষভাবে নির্যাতনকারী বা নির্যাতিতকে প্রভাবিত করে। আমরা মনে করি এ বিষয়টি কর্মশক্তিকে দুর্বল করে তুলেছে।

২. নির্যাতন পদ্ধতি গুলো ভঙ্গুর না হয়ে বরং জটিল হওয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যারা এর থেকে লাভবান হয়, প্রায়ই একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসে। এদের একটি পক্ষ আক্রান্ত হলে অপর পক্ষগুলো তাকে রক্ষায় এগিয়ে আসে। আমরা উপলব্ধী করেছি এসব পক্ষ নিজেদের জন্য মানবাধিকার কৌশল তৈরীতে আগ্রহী হয় না।

৩. অধিকাংশ সংস্থাই সীমিত সংখ্যক কৌশল নিয়ে কাজ করে থাকে এবং কদাচিৎই এসব বিষয়ে সহযোগিতার কথা ভাবে। প্রত্যেক সংস্থা তার সামর্থ্যের ভিত্তিতে কৌশল প্রণয়ন করে থাকে। আমরা মনে করি কৌশলগুলোর মধ্যে আরও সমন্বয় সাধন কৌশলমালাকে অধিক ফলপ্রসূ করে তুলবে।

৪. রেখাচিত্রে প্রতিস্থাপিত বহু সম্পর্কই বর্তমান কর্মপ্রক্রিয়ার আওতার বাইরে থেকে গেছে বা তা প্রভাবিত হয়নি অথবা সেগুলোর শক্তিমত্তাকেও যাচাই করা হয়নি। আমরা মনে করি আরও ব্যাপক আকারের কৌশলমালা এসব সম্ভাবনাময় পক্ষকে সংশৃষ্ট করণে জরুরী।

বিদ্যমান কিছু স্ট্র্যাটেজির জন্য এমন এক ম্যাক্রো ফ্রেমওয়ার্ক দরকার, যেখানে অনেকের সীমিত সম্পদগুলো আরও ফলপ্রসূভাবে একত্রিত করা যেতে পারে। এজন্য 'স্ট্র্যাটেজিক কনভিনর' এর প্রয়োজন হতে পারে যা, নৈতিক বিশ্বস্ততা সম্পন্ন একটি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, এবং যা আমাদেরকে নতুন কর্ম সম্পর্কের দিকে নিয়ে যাবে। তবে অন্যান্য সংস্থা যারা নতুন পথে সমাজের জটিল পদ্ধতিগুলো নিয়ে কাজ করতে চান এবং সমাজের নতুন পক্ষগুলোর কর্মপ্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করতে চান, তারাও এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে পারেন। এ বইটি 'দি নিউ ট্যাকটিকস ইন হিউম্যান রাইটস প্রজেক্টে'র অংশ বিশেষ, যা মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলোর নিজেদের মধ্যে সংলাপে এবং অধিকতর ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণে আবশ্যক উপকরণগুলোকে বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত করতে সাহায্য করে।

প্রসরমান ধারণা

যুক্তরাষ্ট্রে নির্যাতিতের চিকিৎসার্থে ১ম বড় আকারের চিকিৎসা কেন্দ্র 'দি সেন্টার ফর ভিক্টিমস অফ টর্চার' (সিভিটি) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালে। শুরু থেকেই সিভিটি মানবাধিকার গোষ্ঠীর পক্ষে সহায়ক নতুন ধারার কর্মকৌশল প্রণয়নে সচেষ্ট হয়। আমাদের কর্মকান্ড কি ধরণের কর্মকৌশলের উদ্ভব ঘটাতে পারে, তা উপলব্ধী করতে পারায় আমরা নির্যাতিতের জন্য আরও নানামুখী চিকিৎসা কর্মসূচী সম্পর্কে ভাবতে ও সে সম্পর্কে উৎসাহ যোগাতে সক্ষম হয়েছি। এ সব নতুন প্রতিষ্ঠান মানবাধিকার আন্দোলনের পক্ষে নতুন কৌশলগত সুযোগের সৃষ্টি করে, যেমন আতঙ্কগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করা এবং মানবাধিকারের নতুন কেন্দ্র হিসাবে হেলথ কেয়ার কম্যুনিটিকে সংগঠিত করা। আমরা অন্যান্য দল ও জনগণের কাহিনীও সংগ্রহ করতে থাকি যারা নতুন ধারা প্রবর্তনে উৎসাহ দেখিয়েছিল।

দি নিউ ট্যাকটিক্স প্রজেক্ট সম্বন্ধে ১ম ভাবা হয় ১৯৯৫ সালে । অতপর সিভিটি 'বেস্ট প্রাকটিসেস' সিম্পোজিয়াম আয়োজনের লক্ষ্যে তুরস্কে উপদেষ্টা গ্রুপগুলোকে ডেকে পাঠায়। এ সিম্পোজিয়ামে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সমাধানের উপায় অথবা তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কৌশলগুলো খতিয়ে দেখা হয়। আমরা সমস্যার চাইতে সমাধানের

উপরই গুরুত্ব দিই, যেহেতু নাগরিক সমাজ এবং সরকার তেমন সোচ্চার না হওয়ায় মানবাধিকার লঙ্ঘণের ব্যাপারগুলো ক্রমাগত ঘটেই চলেছিল। আমরা সমস্যা সম্পর্কিত ওরিয়েন্টেশানে বিশ্বাস করলেও ইতোমধ্যেই তা মানবাধিকার আন্দোলনের প্রধান ধারায় বেশ ভালভাবেই এগিয়ে চলছিল। তবে সমস্যাগুলো "কি" তা খতিয়ে দেখা হলেও "কি ভাবে" সমাধান করা যেতে পারে তা তেমন করে ভেবে দেখা হয়নি।

নতুন কর্মকৌশল সংক্রান্ত এ ধারণা তুরস্কের বিভিন্ন মতাবলম্বী নেতাদের শ্রদ্ধা ও সাড়া অর্জন করে। ১৯৯৭ সালে সিভিটি দুটি তুর্কী সংস্থা 'হেলসিংকি সিটিজেনস্ এ্যাসেমব্লী' এবং 'দি হিউম্যান রাইটস সেন্টার অব দি টার্কিশ এ্যান্ড মিডল্ ইস্টার্ণ ইনস্টিটিউট ফর পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশান' - এর সাথে 'নিউ ট্যাকটিক্স ইন হিউম্যান রাইটস্ প্রজেক্ট' প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা গড়ে তোলে। ১৯৯৯ সালে জন ডি. এবং ক্যাথেরিন টি. ম্যাকার্থার ফাউন্ডেশানের সহায়তায় নতুন নতুন কৌশলের উপর পদ্ধতিগত গবেষণা শুরু হয়। আমরা রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ে বিশ্ব নেতৃত্বের ১ম সারির ৯ জনকে নিয়ে আন্তর্জতিক উপদেষ্টা কমিটি প্রতিষ্ঠা করি এবং ইতিবাচক কৌশলমালা চিহ্নিত করতে এবং প্রকল্পের সার্বিক পরিচালনায় অবদান রাখতে বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি অঞ্চল হতে ২১ জন মানবাধিকার নেতা সমন্বয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করি।

এ ওয়ার্কিং গ্রুপ ২০০০ সালে ইস্তাম্বুলে তুর্কী উপদেষ্টা গ্রুপ সদস্যদের সাথে সাক্ষাত করে। কানাডার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী কিম ক্যাম্বেল আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা কমিটির প্রতিনিধিত্ব করেন এবং এ সভার সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। এ গ্রুপ মানবাধিকার উন্নয়নে নতুন ধারার চিন্তাভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন, ক্রস-ট্রেনিংয়ের ছক তৈরী করেন এবং প্রকল্পের ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ করেন।

প্রায় সারা জীবন যারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেছেন তাদের মতে সভায় উপস্থাপিত ধারণা ও অভিজ্ঞতা নতুন লোকদের সম্পৃক্তকণের এবং নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়কে দেখার সুযোগ এনে দেয় । আমরা মানবাধিকার কর্মীদেরকে কৌশলগত উদ্ভাবনে সাহায্য করতে উপকরণ, বই, ওয়েবপেজ (www.newtactics.org) এবং আঞ্চলিক ক্রস-ট্রেনিং কর্মশালার মাধ্যমে সাহায্য করি।

আমাদের ভাবনা

গত ১৬ বছর আমি সিভিটির সাথে কাজ করে নির্যাতিতের জন্য চিকিৎসা কর্মসূচীর সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধী করেছি । নির্যাতন প্রতিরোধ এবং নির্যাতিতের যত্ন এ দুইয়ের মধ্যে যে আপাত ব্যবধান তাও উপলব্ধী করতে সক্ষম হয়েছি। সিভিটির মতে নির্যাতিতের যত্নের অর্থ হল আতঙ্ক থেকে মুক্তিতে এবং নেতৃত্বের অধিকার ফিরে পেতে জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করা। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, নির্যাতিতের সুস্থতা নিরাপদ রাজনৈতিক আবহ সৃষ্টি করে, যা জনগোষ্ঠীকে একত্রে কাজ করায় এবং ঝুঁকি গ্রহণে সাহায্য করে। সিভিটির মত চিকিৎসাকেন্দ্র শিক্ষাবিদ, স্বাস্থ্য সেবায় জড়িত পেশাজীবী এবং আইন প্রণেতাদের নতুন নতুন গ্রুপকে মানবাধিকার সংক্রান্ত কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করেছে। আর আমরাও নির্যাতন বন্ধে এবং নির্যাতিতের জীবনমান উন্নয়নে পলিসি ও আইন তৈরীতে আমাদের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছি। প্রথম থেকেই আমরা মানবাধিকার বিষয়ে নতুন কৌশলমালার বাস্তবায়নে কাজ করে আসছি।

৭০ এবং ৮০ দশকে আন্তর্জাতিক শিশু খাদ্য ক্যাম্পেইনে আমার ভূমিকা 'নয়া কৌশল' সম্বন্ধে আমার চিন্তাধারা বিকাশে সাহায্য করে। ১৯৭৬ সালের শেষের দিকে ক্ষুধা সংক্রান্ত ইস্যু নিয়ে কর্মরত একটি তৃণমূল কর্মীদলের প্রধান হিসাবে আমি দায়িত্ব পালন করি। এ কর্মসূচীর বাজেট ছিল আমার বেতন সহ বার্ষিক ৫০০ ডলার। আমাদের একটি ছোট দল সারা দেশে কাজ শুরু করে এবং 'ইনফ্যান্ট ফর্মুলা এ্যাকশান কোয়ালিশান' (INFAC) গঠন করে। আমরা আমাদের সামান্য সামর্থ্য নিয়ে মায়ের দুধের বিকল্প দ্রব্য বাজারজাত না করায় বাধ্য করতে বিশ্বের বৃহত্তম ফুড কর্পোরেশান নেস্লের বিরুদ্ধে বয়কট অভিযান শুরু করি। আমরা ৩০০ আমেরিকান চ্যাপ্টারের একটি নেটওয়ার্ক এবং ৪০ মিলিয়ন সদস্য সম্বলিত ১২০ টি জাতীয় সংস্থার কোয়ালিশান, ১০ টি দেশে আন্তর্জাতিক তৃণমূল বয়কট সংগঠন এবং ৬৭টি দেশে কর্মরত ১ম ট্রান্সন্যাশনাল ইস্যু নেটওয়ার্ক - IBFAN গড়ে তুলি। আমরাই ১ম বেসরকারি সংস্থা যাদেরকে জাতিসংঘ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য অন্যান্য দেশ এবং কর্পোরেশানের সাথে একত্রে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ সম্মেলনেই প্রথম কর্পোরেট মার্কেটিং কোড প্রণীত হয়।

প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমান রাজস্বের ক্ষতির পর নেস্লে তার বিপনন পলিসি পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক কোড পালন সংক্রান্ত যৌথ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এ চুক্তি "আন্তর্জাতিক পণ্য ব্যবহারকারীদের সবচাইতে বড় বিজয়" হিসাবে সর্বত্র অভিনন্দিত হয়।

আমি প্রায় ১ দশকের এ ক্যাম্পেইনের জন্য গর্বিত, অবশ্য আমাদেরও কিছু ভুল ভ্রান্তি ছিল, যার সামান্য কিছু আমি চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছি। প্রথমত আমি ট্যাকটিক্স বা কর্মকৌশলের সাথে স্ট্রাটেজি বা কর্মপন্থার সম্পর্ক নির্ণয়ে ভুল করি। স্ট্রাটেজিক পরিকল্পনা হল আপনার সামনে কি কি পথ খোলা আছে তার বিবরণ। আর আমার সামনে খোলা ছিল একটিমাত্র অপরিহার্য পথ। ভুল সংশোধনে সচেষ্ট তৃণমূল পর্যায়ের অনেক নেতাদের মত আমিও কর্মকৌশল সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করি এবং প্রাপ্ত উপকরণ সম্বন্ধে সামান্য ধারণা নিয়ে স্ট্রাটেজি নির্ণয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকি।

যেহেতু একটি সংস্থার স্ট্র্যাটেজি নির্ণয়ে আমার অভিজ্ঞতা ছিল বেশি, আমি পরিষ্কার ভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম যে যত বেশি কর্মকৌশল সম্বন্ধে আমরা জানব ততই স্ট্র্যাটেজি নির্ণয়ে আমাদের সুবিধা হবে। আমি কোন যুক্তিতর্ক খাড়া করছি না যে, কর্মকৌশলগত ভাবনা বা প্রশিক্ষণ কর্মপন্থাগত ভাবনা কে অতিক্রম করে, বরং বলতে চাইছি কর্মকৌশলগত উন্নয়ন স্ট্র্যাটেজিক বা কর্মপন্থাগত ভাবনাকে সমৃদ্ধ করে।

লক্ষ্য, কর্মপন্থা ও কর্মকৌশল

কর্মকৌশল প্রয়োজনীয় হলেও তা একটি সংস্থার জন্য প্রথম অগ্রগন্য বিষয় নয়। একটি সংস্থা প্রথমে অবশ্যই তার সুপরিসর লক্ষ্য নির্ধারণ করবে। যে লক্ষ্য তার প্রতিষ্ঠাতা, কর্তাব্যক্তি বা সদস্যদের মূল্যবোধ ও বিশ্বাস কে প্রতিফলিত করবে এবং যা তার মিশন ও উদ্দেশ্যকে সংযুক্ত করবে। এ লক্ষ্য অবশ্যই সংস্থার পরিকল্পনাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরবে। একটি সংস্থার জন্য আবশ্যিকভাবে আরও প্রয়োজন মধ্যবর্তী লক্ষ্য নির্ধারণ করা, যা এ সংস্থা সামনে কি করবে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সহ আর কি করা যেতে পারে সে সম্পর্কিত স্ট্রাটেজিক ভিশন তুলে ধরে।

স্ট্রাটেজি বা কর্মপন্থা সম্পর্কে ঘাবড়াবার কিছূ নেই, যদিও কর্মপন্থা নিয়ে চিন্তা করা কঠিন এক কাজ। স্ট্যাটেজি কোন একক সিদ্ধান্তের ব্যাপার নয় বরং তা মূল উদ্দেশ্য ও যথার্থ লক্ষ্য নির্বাচন, সম্পদ সম্বন্ধে ধারণা এবং কখন কোন ট্যাকটিক্স বা কর্মকৌশল অবলম্বন করতে হবে এ রকম বহু সিদ্ধান্তের সমাহার। ২০০০ বছরেরও আগে সান জ্যু শিক্ষা দেন যে কৌশলের উদ্ভব আসলে তখনই হয়েছে যখন আমরা আমাদের নিজেদের ,আমাদের প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বীতার স্থান সম্বন্ধে ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করেছি। প্রতিপক্ষের কর্মকৌশলই আমাদেরকে তার বিরুদ্ধে স্ট্রাটেজি অবলম্বনে সাহায্য করে। আমাদের কর্মকৌশল কি অথবা কি আমরা সার্থকভাবে সম্পন্ন করতে পারি ইত্যাদি বিষয় কর্মপন্থা প্রণয়নে ভূমিকা রাখে। অতএব কর্মকৌশলগত ভাবনাই আসলে কর্মপন্থাগত ভাবনার মূল নিয়ামক।

কর্মকৌশল হল কর্মপন্থার অন্তর্গত সুনির্দিষ্ট কর্মদ্যোগ বিশেষ এবং বিশ্বে পরিবর্তন আনতে আমাদের সম্পদসমূহ সুসংগঠিত করার একটি উপায়। এমনকি একে একদিকে একটি প্রতিষ্ঠান বা পদ্ধতি এবং অন্যদিকে বিশেষ দক্ষতা বললেও অত্যুক্তি হবে না। সংস্থার আকার, সামর্থ্য এবং সম্পদের ভিত্তিতে কর্মকৌশল ভিন্নতা পেতে পারে। কর্মকৌশল পরিবর্তন ঘটাতে প্রয়োগ করা হয়, পক্ষান্তরে স্ট্রাটেজি কি ধরণের কর্মকৌশল হাতে নেয়া যেতে পারে তার সিদ্ধান্ত প্রদান সহ কর্মলক্ষ্য কি হবে এবং কি ধরনের সম্পদ ব্যবহার করা যেতে পারে তার নির্দেশনা দেয়। কর্মকৌশল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানই স্ট্রাটেজি নির্ধারণে সাহায্য করে।

১.কর্মকৌশলগত জ্ঞান আমাদের কর্মপন্থাকে প্রভাবিত করে

আমি এখানে খুব বেশি কিছু বলতে চাই না। সমগ্র মানব ইতিহাসের প্রত্যেক স্তরেই যখনই কেউ কোন সমস্যা সমাধানে কেউ এগিয়ে এসেছে সেখানেই সামনে এসেছে সমাধানের নতুন কোন পথ। অবশ্য একই সমাধানের বারংবার ব্যর্থ প্রয়োগের উদাহরণও মানব ইতিহাসে কম নেই। সামরিক বাহিনীর ইতিহাস থেকে আমরা এ বিষয়ে দুটো ভাল উদাহরণ টানতে পারি।

১) উন্নত গ্রীক বাহিনী এমন একটি যুদ্ধ কৌশল আবিষ্কার করে, যা ঐতিহ্যকভাবে নির্ভর যোগ্য মারাত্মক অশ্বারোহী বাহিনীকে পরাভূত করে।

২) ৫ম হেনরীর রাজত্বকালে ইংরেজ সেনাবাহিনীতে দীর্ঘ ধনুকের সংযোজন মারাত্মক বর্ম আচ্ছাদিত যোদ্ধাদেরকে পরাভূত করে। এভাবে কৌশলগত উদ্ভাবন নতুন স্ট্র্যাটেজির সুযোগ এনে দেয়।

যদি আমরা আমাদের কর্মপরিকল্পনাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে না পারি তবে কোন সম্ভাব্য কাজও ঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। শিশু খাদ্য সংক্রান্ত ক্যাম্পেইনের সময় আমি বহু ভাল ভাল পরামর্শ কাজে লাগাতে পারিনি, কারণ আমি জানতাম না কিভাবে তা করব।

২. বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজন নানামুখী কর্মকৌশল

সব লক্ষ্যমাত্রায় একই কর্মকৌশল কাজ করে না। গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য পত্র-লিখন কৌশল যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের জন্য তা হবে অন্য রকমের। অর্থনৈতিক বয়কটের জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক অবস্থা ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা। আমাদেরকে অবশ্যই পরিপূর্ণ ফলাফল অর্জনে লক্ষ্য অনুযায়ী কর্মকৌশল নির্ধারন করতে হবে, যদি তা কাজ না করে তবে নতুন কর্মকৌশল হাতে নিতে হবে।

৩. ক্ষেত্র অনুযায়ী কর্মপন্থা গ্রহণ

আমরা নিজস্ব স্বকীয়তা অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি। ভাল শিক্ষকবৃন্দ তা স্বীকার করেন বিধায় বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা দানে আগ্রহী হন। মানবাধিকার কর্মকান্ডে জনগণের বড় অংশের সম্পৃক্ততায় এবং সামাজিক পরির্তনে আমাদেরও একই কৌশল অবলম্বন করা দরকার।

কিছু লোক নির্যাতনকারীর বাড়ির সামনে পিকেটিং করাকে ভয়ঙ্কর কৌশল বলে মনে করেন, আবার পত্র-লিখন পদ্ধতি কারও কারও কাছে সুদূর পরাহত ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। আমরা এ বিষয়ে বিতর্ক করতে পারি, আবার এটাও মেনে নিতে পারি যে, ঘটনার প্রেক্ষিত, ঝুঁকি গ্রহণের ইচ্ছা, সময় ইত্যাদি ভেদে জনগণ ভিন্ন ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করতেই পারে।

যদি মানবাধিকার গোষ্ঠী মাত্র একটি কি দুটি কৌশল গ্রহণ করে তবে আমরা বলব যে সীমিত ক্ষেত্রেই তা প্রয়োগ করা উচিত। যেমন বলা যায় বিরাট জনগোষ্ঠীর জন্য আইনী কৌশল অবলম্বন করা খুবই কঠিন এক ব্যাপার, কারণ এগুলো খুবই জটিল বিষয় বলে সামান্য কিছু উচ্চ পেশাজীবী লোক ছাড়া অনেকের কাছেই তেমন গুরুত্ব পায় না। আমাদের উচিত আরও অধিক লোকের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিতে নতুন নতুন কৌশল গ্রহণ করা।

নির্যাতিত জনগোষ্ঠী স্বভাবতই তাদেরকে চলমান জীবন থেকে আড়াল করতে চায়। তাদেরকে সংস্কৃতি চর্চা আর চলমান জীবন যাপনে ফিরিয়ে আনতে আমাদের ঝুঁকিমুক্ত নানা কৌশল অবলম্বন করা উচিত।

৪. কৌশলগত ভিন্নতা বিস্ময়ের সৃষ্টি করতে পারে

একই কর্মকৌশল ঘন ঘন প্রয়োগের ফলে আমাদের প্রতিপক্ষ তা প্রতিরোধে সক্ষমতা অর্জন করে, ফলে তাদের ক্ষতির আশঙ্কাও কমে আসে।

যখন আমরা নেস্লের বিরুদ্ধে বয়কটের উদ্যোগ গ্রহণ করি, তারা একটু বেশী মাত্রায় নড়ে চড়ে বসে, ফলে ভুলও করে অনেক বেশী। পরিণতিতে বয়কটও আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন এ বয়কট অভিযান থিতিয়ে আসে নেস্লে সমালোচনা প্রতিরোধের কৌশল নির্ণয়ে বেশ সময় পায় এবং সফলতার সাথে পাল্টা আক্রমন করতে থাকে। আমরা কোম্পানীকে কুপোকাত করতে বার বার কৌশল পরিবর্তন করতে থাকি যাতে তাদের কৌশল ভেস্তে যায়।

যেহেতু মানবাধিকার অবিরামভাবে লজ্ঘিত হতে পারে তাই এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে প্রয়োজনীয় সামর্থ্য আর সম্পদের অধিকারী শক্তিশালী প্রতিপক্ষ থাকা দরকার। আমরা এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ১ম পত্র-লিখন ক্যাম্পেইনের কথা স্মরণ করতে পারি কারণ এ কৌশল চমক সৃষ্টি করেছিল। পাশাপাশি এও মনে রাখা দরকার যে মাত্র ৩০ বছরের মধ্যে কিভাবে বেশির ভাগ রাষ্ট্র তাদেরকে এ কৌশল থেকে রক্ষা করতে শিখেছিল।

চমক সৃষ্টির ফলে প্রতিপক্ষ অস্থির চিত্তে বহু ভুল করে ফেলে এবং তাদের অবস্থান হয়ে পড়ে দুর্বল। আবার এ কৌশলগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগও আসতে পারে।

৫. কর্মকৌশল অংশগ্রহণকারী ও পর্যবেক্ষকদেরকে বিশ্ব কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে শেখায়

১ম শিশু খাদ্য ক্যাম্পেইন (১৯৭৫-১৯৮৫) বিশ্ব রাজনীতি পরিচালনায় নতুন দিক নির্দেশনা দিয়েছিল। এটা ছিল এক চ্যালেঞ্জ কারণ ক্যাম্পেইনের প্রত্যেকটি পর্যায়ে নতুন দৃষ্টান্তের সৃষ্টি হয়েছিল: এমন কেউ ছিল না যে আমাদেরকে পরবর্তীতে কি করতে হবে তা জানাবে। তারপরও একই ভাবধারায় বহু ক্যাম্পেইন হয়েছে এবং তা আরও দ্রুত তালে এগিয়ে গেছে। ভূমি মাইন নিষিদ্ধকরণে আন্তর্জাতিক ক্যাম্পেইনের কথাই ধরা যাক, যা মাত্র ১৮ মাসে তার লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয়। আর INFACT এর ক্ষেত্রে আমাদের লাগে প্রায় ১০ বছর।

মনে রাখা দরকার আমরা যত বেশি চর্চা করব আমাদের মাংসপেশীও তত সহজভাবে কাজ করবে। আমরা উরুগুয়ের একটি উদাহরণ টানতে পারি। প্রায় ৭০ বছর যাবত একটি সংসদীয় আইন পাল্টাতে উরুগুয়ে সংবিধানের
হাঁ-না ভোটের প্রয়োগ করা হয়নি। উরুগুয়ের মানবাধিকার গোষ্ঠী এ ধারাকে প্রতিহত করতে যোগ্য ভোটারের ২৫ শতাংশের দরখাস্ত গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য ছিল স্বৈরশাসকের আমলে যারা সাধারণ জনগণকে নিগৃহীত ও হত্যা করে তাদেরকে শাস্তির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো। এ গণভোট সামান্য ব্যবধানে পরাস্ত হলেও উরুগুয়ে জনগণের জন্য তা রাজনীতির নতুন দরজা উন্মুক্ত করে। পরবর্তী ১২ বছরে ৮ বার এ ধরণের গণভোটের আয়োজন করা হয়।

৬. কর্মকৌশল হল অংশগ্রহণকারী এবং মিত্রদেরকে সংস্থার কাজে সম্পৃক্তকরণে একধরণের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

কিছু কর্মকৌশল স্বল্প মেয়াদী (যেমন পদযাত্রা) আবার কিছু দীর্ঘ মেয়াদী (যেমন বয়কট)। তবে উভয়ের জন্য দরকার পরিকল্পনা, সমন্বয় এবং নির্দেশনা। এখানে বহু লোকের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। সংস্থা বা ক্যাম্পেইনের কর্মকান্ড তাদেরকে শেখার ও অঙ্গীকারবদ্ধ হবার সুযোগ এনে দেয়। নতুন কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের পক্ষে কৌশলগত কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্টতা চমৎকার প্রশিক্ষণের কাজ করে।

সিভিটি যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে ১ম 'টর্চার ভিক্টিম রিলিফ এ্যাক্ট'[২] এর উত্থাপনের প্রস্তাব করলে আমরা অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থা, ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং সম্ভাব্য মোর্চাদেরকেও এক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করার এ সুযোগকে কাজে লাগাই। এতে তারাও নির্যাতিতের অভিজ্ঞতা ও তাদের চিকিৎসা কর্মসূচী সম্বন্ধে প্রভূত ধারণা পাওয়ার সুযোগ পায় এবং নিপীড়ন বিষয়ক আমাদের ধারণা ও অভিজ্ঞতা তাদের ভাষায় সংযুক্ত করে।

কৌশলগত ভাবে আমাদের ধারণা প্রসারের মাধ্যমে মানবাধিকার সংগঠনগুলো যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে :

১) কর্মকৌশলের অপ্রতুলতা তার প্রয়োগের ক্ষেত্রকেও সংকুচিত করে। ঠিক উল্টোটি ঘটে যদি তা ব্যাপক আকারের হয়।
২) কোন একক কর্মকৌশলের উপর অধিক নির্ভরশীলতা এ কৌশলকে ভুল পথে চালিত করতে পারে। একই সাথে তা কর্মপন্থাগত লক্ষ্যমাত্রা প্রসারেও বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এ বিষয়ে নমনীয় চিন্তাধারা কৌশলগত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সুযোগ করে দিতে পারে।
৩) কোন কৌশলের ঘন ঘন প্রয়োগ প্রতিপক্ষকে পাল্টা আক্রমনের সুযোগ করে দেয় এবং তাকে তার অবস্থান সমর্থনের সহজ পথ বাতলে দেয় ।